বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ঃ

ঘুরে এলাম মংগার দেশ থেকেঃ ২

অজয় রায়

খেদাইমারীতে কয়েক ঘণ্টা - এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা:

আমার মুল গন্তব্যস্থল খেদাইমারী গ্রাম। ব্রহ্মপুত্রের বুকে জেগে ওঠা উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটি বিশাল চর। এর ডান পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা নদী যা ভারতীয় সীমান্তের ওপার থেকে বেড়িয়ে এসেছে, এবং পুনরায় দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। নদীটি স্থানীয়ভাবে হলহলিয়া নামে পরিচিত। আর বাম পাশ দিয়ে প্রবাহিত বিশাল প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্র অসংখ্য চর ভেদ করে। খেদাইমারী গ্রামটি প্রশাসনিকভাবে বন্দবেড় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এটি তিনভাগে বিভক্ত- উত্তর খেদাইমারী, মধ্য খেদাইমারী ও দক্ষিণ খেদাইমারী। আমরা যাব দক্ষিণ খেদাইমারী যেখানে অবস্থিত ‘খেদাইমারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।’ এটিরই পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় আমরা অংশ নিতে আগ্রহী। রৌমারী থেকে দুরত্বের হিসেবে খেদাইমারী মাত্র ২০-২৫ কিলোমিটার। মাঝখানে হলহলিয়া নদী। বর্ষাকালে আগস্ট পর্যন্ত নৌকাই একমাত্র ভরসা সময় লাগে ঘন্টাখানেক। অন্য সময় হলহলিয়া নদী নৌকায় পারি দিয়ে- এর পর মেঠো পথ, বাঁধ, ক্ষেতের ভেতর ও মানুষের বাড়ীর উঠানের ওপর দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে হয় গন্তব্য স্থলে। হাঁটা বা সাইকেল ছারা উপায় নেই। তবে বিকল্প আছে তাদের জন্য যাদের রয়েছে মোটর সাইকেল এবং এবরো থেবরো কাঁচা রাস্তার অসম ঝাকুনি সহ্য করার ক্ষমতা এবং এ ধরণের পথে মোটর সাইকেল চালানোর দক্ষতা। এটি আমার জানা ছিল না, ভেবেছিলাম নৌকা দিয়ে জলপথে আমরা খেদাইমারীতে যাব। রাত্রে শুভ্রাংশু বাবু জানালেন যে আমরা মোটর বাইকে করে সকাল ৯ টায় রওয়ানা দেব খেদাইমারীর উদ্দেশ্যে। আমাকে একজন সবচাইতে দক্ষ মোটর বাইক চালকের পেছনে বসিয়ে দেওয়া হবে। সময় লাগবে দু’ থেকে আড়াই ঘণ্টা। আমার তো আত্মবিস্মৃত হবার যোগার এবং আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার অবস্থা। অনেক অনুনয় বিনয় করলাম বিকল্প ব্যবস্থা করার, কিন্তু একমাত্র ‘কিছু হবে না, আপনি পারবেন’ এই স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ ছাড়া আয়োজকরা অন্য কিছু করা আদৌ সম্ভব নয় বলে শেষ কথা জানিয়ে দিলেন। ‘অগত্যা মধুসুদন’ এই আপ্তবাক্য উচ্চারণ করে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ঘুমুতে গেলাম।

পরদিন সকালে আমরা ২৪ জন অশ্বারোহী, না ভুল বললাম মোটর-সাইকেলারোহী, ১২টি মোটর বাইকে সকাল ৯-১৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করলাম। আমার চালক ভরসা দিলেন এই বলে, ‘স্যার শুধু আমাকে ধরে থাকবেন’; কিভাবে ধরতে হবে তা শিখিয়ে দিলেন। শক্ত সমর্থ সুঠাম দেহী যুবক, সে অঞ্চলের একজন পরিচিত

সমাজসেবী। আমি যে একেবারে নবীশ তা নই, তবে দীর্ঘ ২০ বছর পর আবার মোটর বাইকে আরোহন, তাও অন্যের পেছনে। ৬ কিলোমিটার পথ মোটামুটি ভাল পীচঢালা রাস্তায় উত্তরে গিয়ে পশ্চিমের কাঁচা রাস্তা ধরলাম। পথ মোটামুটি মসৃন। অনতিকাল পরেই এসে পড়লাম হলহলিয়া নদীর খেয়াঘাটে। শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকায় পারাপারের ব্যবস্থা - একসাথে ১০-১২টি মোটর বাইক ওঠানোর চমৎকার ব্যবস্থা আমাকে মুগ্ধ করল। ১০ মিনিটের মধ্যেই আঁকাবাঁকা পথ ধরে খেয়া যানটি আমাদের ওপারে পৌঁছে দিল। এবারই আমার আসল পরীক্ষা, সাবধান করে দিলেন দিলেন আমার চালক- ‘সামনে কঠিন ভাঙাচোরা- চড়াই-উৎরাই খচিত’ রাস্তাহীন পথ। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই রপ্ত করে ফেললাম রাস্তার পরিবেশের সাথে, খুব একটা অসুবিধা হচ্ছিল না। এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। পশ্চিম-পুব, উত্তর দক্ষিণ করে, অবশেষে ক্রমাগত দক্ষিণে চলে আমরা উপনীত হলাম খেদাইমারী বাজার পেরিয়ে খেদাইমারী নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল প্রাঙ্গনে। সময় তখন ১১-৩০ মিঃ সকাল। উজ্জ্বল রোদস্নাত স্কুল প্রাঙ্গন। সেখানকার আয়োজকরা আমাদের স্বাগত জানালেন, পথে আমার খুব কষ্ট হয়েছে অনুমান করে অনেক সমবেদনা জানালেন। আমি সত্যিই অভিভুত। পথের ক্লেশ আমি ভুলে গেলাম। আসলে গ্রামবাংলায় গেলেই আসল মানুষের সান্বিধ্য লাভ হয়।

ছবিঃ আমাদের দলটি হলহলিয়া নদী অতিক্রম করছে

স্কুল কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় সুধীজনেরা একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন যার মাধ্যমে *মুক্তমনা* সংগৃহীত সামান্য কিছু অনুদান আমরা শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ ও মুক্তমনার পক্ষ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে চাই। আমার মত অতি নগন্য ব্যক্তির আগমনকে মনে রেখে অনুষ্ঠানটির নাম দিয়েছে ‘ অত্র বিদ্যালয়ে ... এর শুভাগমন উপলক্ষ্যে ঐদিন সকাল ১০.০০ টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সুধী সমাবেশ’। আমি একদিকে আপ্লুত, অন্যদিকে বিব্রত এবং অস্বস্তিবোধে পীড়িত।

চমৎকার একটি উনমুক্ত প্রাঙ্গনে বিদ্যালয়টি অবস্থিত; উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত খোলা মাঠ। মাঠের উত্তর দিকে আদি স্কুল ভবন- এটি দিয়েই ২-৩ বছর আগে স্কুলটি যাত্রা শুরু করে। এটি কংক্রিটের খুঁটির ওপর তোলা একটি ঘর, টিনের ছাদ, বাঁশের বেড়া। মাঠটির পুর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে মোটামুটি একই মাপের দুটি ভবন রয়েছে। ভবন দুটি বেশ ক'বছর আগে ঐ এলাকার বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে নির্মিত হয়েছিল 'কেয়ার' সৌজন্যে। স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পন করা হয় স্কুল হিসেবে ব্যবহারের জন্য। টিনের ছাদ এবং মজবুত কংক্রিটের স্তম্ভের ওপর দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত ভবন দুটি। পাঁচ ইঞ্চি ইটের দেওয়াল।

ছবিঃ খেদাইমারি গ্রাম

সাম্প্রতিক বন্যায় আদি স্কুল-ঘরটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশী। বাঁশের তৈরী বেড়া-বেষ্টনি উড়ে গেছে, কয়েকটি খুঁটি বেঁকে গেছে, কিছু টিন ভেসে গিয়েছিল; তবে মেঝেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচাইতে বেশী। অন্য ভবন দুটির ক্ষতি তেমন হয় নি, কোন কোন স্থানে দেওয়াল ভেঙে গেছে বা সামান্য ক্ষতি হয়েছে। তবে ক্ষতি হয়েছে আসবাব পত্র বা ফার্নিচারের- ছাত্র-ছাত্রীদের বসার চেয়ার-বেঞ্চ এড়াং অফিসের আসবাব পত্র। বছর দুয়েক আগে স্কুলটি চালু হলেও স্থানীয় মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এটি দাঁড়াতে পারছিল না। এড়াং বন্যার কারণে যে ক্ষতি হয় এতে স্কুলটির কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা অন্য দুরবর্তী স্কুলে চলে যেতে বাধ্য হয়। বন্যার পরে আমাদের পরিদর্শন দল এলাকাটি দেখতে এলে এই স্কুলটির অবস্থান ও ক্ষতির পরিমাণ এবং স্থানীয় মানুষের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন দল ও রৌমারীর শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের নেতৃবৃন্দ স্কুলটিকে আমাদের পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য নির্বাচন করে। স্থানীয় সুধীজন আবেদন করে, শুধু তাৎক্ষণিক কিছু অনুদান নয়, এটির পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সাথে আমরা যেন যুক্ত হই। এই পটভুমিতেই আমার সেখানে যাওয়া। ইতিমধ্যে নতুন উদ্যমে স্কুলটির কার্যক্রম পুনরায় চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এতুদ্দেশে একটি নতুন স্কুল কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি আশা করে আগামী জানুয়ারী থেকে স্কুলের পুর্নভাবে চালু হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় জনদরদী ও শিক্ষানুরাগী এক ব্যক্তি স্কুলটি স্থাপনাকালে এক একর জমি (১০৯ শতক) দান করেন- যার ওপর স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুল প্রাঙ্গনের দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে একটি সরকারী প্রাইমারী স্কুল।

প্রায় ১২ টার দিকে স্কুল কমিটির চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে শতাধিক স্থানীয় সুধীজন ও শিক্ষানুরাগী মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান শুর“ হল। সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম, শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোগী প্রথমেই আমাদের পুনর্বাসন প্রকল্পের সাথে যুক্ত মুক্তমনার পরিচয়, এবং আমাদের মঞ্চের শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমের কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেন। স্কুল কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব আব্দুল আজিজ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন। সুন্দর শুভে”ছা বক্তব্য অন্যান্যদের মধ্যে রেখেছিলেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী জনাব আলিমুল হক, খেদাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম, চর শৌলমারী উ”চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জসিমুদ্দিন, রৌমারী সি. জে. জামান উ”চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক সরকার, এতদ অঞ্চলের সুপরিচিত সমাজনেতা জনদরদী ব্যক্তিত্ব শুভ্রাংশু চক্রবর্তী প্রমুখ। আমার বক্তব্যে আমি এই স্কুলের পুনর্গঠন কার্যক্রমে আমাদের সামান্য অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ায় মুক্তামনা ও শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুক্তমনা সংগৃহীত সামান্য অনুদান পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের প্রতীক হিসেবে স্কুল কমিটির সভাপতির কাছে অর্পন করলাম, এবং কথা দিলাম স্কুলটির পুনর্গঠন কার্যে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। মোটামুটি দুপুর দেড়টার দিকে সভাপতি মহোদয় তাঁর সভাপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। স্থানীয় মুর“ব্বী ও সুধীজনেরা আমাদের সাথে কোলাকুলি করলেন - মধুর উষ্ণতার স্পর্শে আমি ধন্য হলাম কৃতজ্ঞতায়।

ছবিঃ ব্রহ্মপুত্রের তীর ঘেষে আমাদের দল ফিরছে

খেদাইমারীর সাথেই লাগোয়া ‘চর চিলমারী’, প্রশাসনিক দিক থেকে চিলমারী থানার অন্তর্ভুক্ত। এর পরই মাত্র দু-এক কিলোমিটার দুরে ব্রহ্মপুত্র। গেলাম দেখতে, ওপারেই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চিলমারী নৌবন্দর। মাঝে বৃক্ষশোভিত অসংখ্য ছোট বড় চর। নদী বক্ষে জেলেরা মাছ ধরছে, পাশে নদীর পার ঘেষে ধানক্ষেতের অপরূপ সবুজের সমারোহ। আমাদের সাথের আলোক চিত্রী ছবি তুললেন নানান ভঙ্গিতে।

এবার ফেরার পালা। ফেরার পথে খেদাইমারী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং খেদাইমারী নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব সাইফুল ইসলামের বাসায় আথিত্য গ্রহণ করতেই হল রোজা-রমজানের দিনেও, অনেক পাপ করলাম জানি ওদের কষ্ট দিয়ে।

একই পথ ধরে, একই মধুর কষ্ট সহ্য করে ফিরে এলাম রৌমারী বিকেল চারটায়, তবে ফেরার পথে ‘দাঁতভাঙা’ সীমান্ত এলাকা দেখে আসার ও সেখানকার বিখ্যাত রসগোল্লা কেনার পথকষ্ট স্বীকার করেছি অবলীলায়।

দাঁতভাঙা হল রৌমারী উপজেলার উত্তরতম প্রান্তিক ইউনিয়ন। কয়েক কিলোমিটারি অদূরেই ভারতীয় সীমান্ত - আসামের গোয়ালপারা জেলা। একটি বন্দর ও ব্যাবসায়িক কেন্দ্র। প্রচলিত প্রবাদ হল বিশাল মাছের আঘাতে কোন স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির দাঁত ভেঙে যাওয়ার ঘটনা থেকে এই অঞ্চলের নাম হয়েছে ‘দাঁতভাঙা’। রমজানের মাস হলেও ‘দাঁতভাঙা’ বাজারের মিষ্টি আর খাবার দোকান খোলা। জনৈক মুরুব্বী গোছের ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় জবাব পেলাম, ‘যারা রোজা রাখে না, এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য খোলা রাখা হয়েছে। এতে অসুবিধা তো দেখি না। উমাক ব্যবসা করি খাবার হবে না ?’ আমি অবাক হয়ে ভাবি - গ্রামের সাধারণ সরল জন কত উদার, অথচ শহরের রাজনৈতিক কলুষতায় আমরা হয়ে পড়েছি ধর্মান্ধ; জবরদস্তি করে হোটেল - রেস্তোঁরা বন্ধ করিয়ে রোজা পালন করাচ্ছি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকেও। এ ধরণের অসহিষ্ণু ইসলাম ধর্মই কি প্রচার করেছিলেন পয়গম্বর মুহম্মদ? এই ধর্মান্ধতার কারণে পবিত্র রোজার মাসে কুমিল্লায় হিন্দুদের মিষ্টির দোকান লুণ্ঠিত হয়, ভাংচুর করা হয় ফেনীর অনিল দাসের ভাতের হোটেল।

ছবিঃ প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্রের তীরে ...

আমার সহযাত্রীরা হুরমুর করে ঢুকে পড়লেন পুরানো এক মিষ্টির দোকানে। ব্রাউন রংয়ের রসালো রসগোল্লা অক্লেশে গলাধবকরণ করতে লাগলেন একটির পর একটি। দোকানদার হিন্দু, তিন পুরুষের ব্যবসা- জানালেন তাঁর পিতামহ আবিষ্কার করেছিলেন এই ধরণের রঙিন রসগোল্লা যা শুধু রৌমারীতে বিখ্যাত হয় নি - সারা কুড়িগ্রাম জেলা ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ছড়িয়ে পড়েছে এর সুনাম। নাটোরের কাচাগোল্লা, পোড়াবাড়ীর চমচম, কুমিল্লার রসমালাই, মুক্তাগাছার সন্দেশ, কিশোরগঞ্জের ‘ছানা-সন্দেশ’, ঢাকার ‘কালাচাঁদের আমিত্তি (অমৃতি)’, ঢাকার ‘মরণচাঁদের দধি’, বগুরার দৈ ... ইত্যাদি আমার নিজস্ব চমৎকার মিষ্টির তালিকায় স্থান করে নিল ‘রৌমারীর ব্রাউন রসগোল্লা’ ও। মিষ্টি-মধুর মন নিয়েই আমরা পথ কষ্ট ভুলে ফিরে এলাম রৌমারীর ডাকবাংলোয়। পুরানো ডাক বাংলোটি ভেঙে বছর দুয়েক হল নতুন ডাকবাংলো তৈরী হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রৌমারী প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত মেজর নুরুন্নবী, বীরবিক্রম, তাঁর কোম্পানীর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছিলেন পুরানো ডাকবাংলোতেই। কান পাতলে মুক্তিযোদ্ধাদের পদধ্বনি যেন আজও শোনা যায়।